পূর্বপর্বত
ভ্রমণ কাহিনী

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

।। এক।।

আজকাল পাহাড়ে বড় গোলমাল। সেদিন একটা টি ভি চ্যানেলে দেখছিলাম শিলিগুড়ি স্টেশনে বসে একদল পাহাড় প্রত্যাগত বিধ্বস্ত পর্যটক তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছে। আগের দিন সন্ধ্যার পর তাদের লোলেগাঁওয়ের হোটেলে একদল যুবক ঢুকে পড়ে। তারা বলে, ঘন্টাখানেক সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে পাহাড় ছেড়ে চলে যাও, নইলে-। কিভাবে তিনগুন ভাড়া কবুল করে তারা গাড়ি ঠিক করেছিল, কিভাবে রাতের অন্ধকারে দুর্গম পাহাড়ি পথে তারা প্রাণ হাতে করে সমতলে নেমেছিল, সেই সব বিবরণ শুনতে শুনতে তাদের কষ্ট আশঙ্কা ক্ষোভ আমাদের মনেও ঢুকে যাচ্ছিল। এমন সময় একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ঘটালো ঐ লোলেগাঁও শব্দটি। হঠাৎ যেন বর্তমান ঘটনাক্রমটি গৌন হয়ে গেল। যেন রঙ্গমঞ্চের পর্দা সরে চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আর একটি দৃশ্যপট - ঐ লোলেগাঁওয়েরই। সময় দুপুর, কাল শরৎ, এতক্ষণ পর্যন্ত আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত একটা পাতলা শাদা কুয়াশার পর্দা টানা ছিল। এইমাত্র সেই আস্বচ্ছ জাল কেউ গুটিয়ে নিয়েছে। ঝকমকে রোদ্দুরে অনাবৃত আকাশের প্রান্তে ছোটবড় সাদা সাদা চূড়া নিয়ে ফুটে উঠেছে সাঙ্গোপাঙ্গো সহ কাঞ্চনজঙ্ঘা। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে ধাপে ধাপে নিচের দিকে নেমে গেছে প্রশস্ত উপত্যকা। অনেক নিচে দেখা যায় পাহাড়ি গ্রাম, খেলনার মত ঘরবাড়ি, খাঁজ কাটা চাষের ক্ষেত। তারপর আবার উঁচু জমি,। ঘন বন। মাথার ওপর দুপুরের আলো নিয়ে সেই বনকে আর সবুজ মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে তার রং ধূসর কালো। বনের পিছনে ক্রমে দূরে, আরও দূরে, বহুদূরে, নীল আকাশের গায়ে শ্বেতশৃঙ্গ পর্বতমালা, উত্তর দিকে পুরো আধখানা গোলার্ধ জুড়ে।

হিমালয়ের এই পূর্বপ্রান্তে ইদানিং অনেকগুলি টুরিস্ট স্পট আবিষ্কৃত হয়েছে। সবগুলি থেকেই মোটামুটি একই রকম ভূধরদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। শিলিগুড়ি থেকে কয়েক ঘন্টার দূরত্ব, পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো স্থান থেকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অধিগম্য তাই ভ্রমণপ্রিয় বাঙালির একটা ঢল নেমেছে এদিকে। বুদ্ধি করে চললে এখানে পর্যটনশিল্পের সমূহ উন্নতির সম্ভাবনা আছে।

খুব বেশিদেনের কথা নয় কিন্তু। আপামর জনসাধারনের বেড়াতে যাওয়ার রেওয়াজ এই সেদিনও আমাদের দেশে ছিল না। যাঁরা যেতেন তাঁদের মধ্যে একদল ছিলেন তীর্থযাত্রী। তাঁদের গন্তব্য ছিল পুরী কাশী হরিদ্বার। খুব দু:সাহসী হলে কেদার বদরি। পূর্বদিকে গেলে কামাখ্যা। আর একটা দল ছিল হাওয়া বদলের। স্বাস্থ্যকামী এই শ্রেনীটির গতিবিধি ছিল বিহার ছোটনাগপুরের নানা স্থানে। বিত্তবানেরা সেদেশে এক একটা বাড়িও করে রাখতেন। আর একটা শ্রেনীও ছিল তারা নিতান্তই সংখ্যালঘু, আলোকপ্রাপ্ত, একটু ইংরিজি ঘেঁষা, ব্রাহ্ম ঘেঁষা, উচ্চ চাকুরিজীবী শৌখিন লোক। পূজো আসন্ন হলে ভবানীপুরের তেতলায় সরু মোটা গলায় তাদের আলাপ শোনা যেত (সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথ) এবারে পূজোয় কোথায় যাবে দার্জিলিং না মাউন্ট আবু। কখনও কখনও এমনও ঘটত যে পুরো বালিগঞ্জটাই (তখন সেটাই আধুনিকতার পীঠস্থান) দার্জিলিং ম্যাল এ উঠে গেছে। তখন অমিত রায়ের মত স্বাতন্ত্র্যসাধক যুবককে ছুটতে হত শিংল পাহাড়ের মত পান্ডববর্জিত স্থানে। সে যুগে বঙ্গদেশের পাহাড় বলতে ছিল শুধু দার্জিলিং। সঙ্গে ছিল দুটি ক্ষুদ্র উপগ্রহ - কার্সিরং ও কালিম্পং।

দার্জিলিং বাঙ্গালীর স্মৃতিতে বহুচর্চিত একটি নাম। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সামনে রেখে পাহাড়ের ঢালের ওপর আধখানা চাঁদের আকারে সাজানো এই শহর ইংরেজদের দান। এখানকার উচ্চতা, শীত, বৃষ্টিবহুল জোলো আবহাওয়া, ঘনীভূত ফগ, নিত্যপরিবর্তমান রঙিন মেঘ, এবং পার্বত্য অরণ্য ও আরণ্যক পশু পাখি পতঙ্গ সব কিছুর সঙ্গেই তাদের স্বদেশের প্রচুর সাদৃশ্য ছিল। তাই এই স্থানটি ইংরেজ রাজপুরুষদের মনোহরণ করেছিল। তখন ব্রিটিশ আমলের প্রথম যুগ। কলকাতা ভারতের রাজধানী। কলকাতাবাসী বড়লাটের গ্রীষ্মকালীন দরবার বসবার মত করেই শহর গড়া হল। সুপরিকল্পিত সুন্দর শহর। সর্বোচ্চ চূড়া ঘিরে প্রশস্ত ম্যাল। তাকে বেষ্টন করে ঘুরে ঘুরে ধাপে ধাপে নেমে গেছে পরিচ্ছন্ন পথ ও নিরাপদ অরণ্য। হোটেল, দোকান, বাজার, ঘরবাড়ি, যানবাহন, সব কিছুই এমনভাবে তৈরি হয়েছিল যে পাহাড়ের নিজস্ব রূপ চাপা পড়ত না। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত তৈরি হল সরু রেলপথ। তার ওপর দিয়ে অনেক সময় নিয়ে, গড়িয়ে গড়িয়ে, চারধার দেখাতে দেখাতে, ঝিক্ ঝিক্ শব্দ করতে করতে, যে খেলনা রেলগাড়িগুলি যাতায়াত করত সে যুগের তুলনায় তা ছিল বিস্ময়কর প্রযুক্তর নিদর্শন। সেকালের সেই দার্জিলিং বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। সেখানে ছাব্বিশ বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথ তাঁর কচি মেয়ে বেলাকে নিয়ে সপরিবারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। অনেকগুলি আত্মীয়ার একমাত্র পুরুষ অভিভাবক হওয়ার গুরু দায়িত্বে তাঁর অবস্থা হয়েছিল করুণ। কচি সংসদের দলবল নিয়ে নকুড়মামা যখন দার্জিলিং যান, এবং সেখানে কেষ্ট ও পদ্মের অবিস্মরনীয় কোর্টশিল্প পর্ব সমাধা হয়, তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় নি। সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে শীতঋতুর দার্জিলিং জীবন্ত হয়ে উঠেছে রঞ্জনের শীতে উপেক্ষিতায়। আর ষাটের দশকের দার্জিলিং শুধু মনশ্চক্ষে নয়, চর্মচক্ষেও আমরা দেখতে পাই সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবিতে। যে সব প্রবীণ মানুষের স্মৃতিতে পুরনো দার্জিলিং এখনো বেঁচে আছে তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলবেন এখনকার এই নতুন শৈলাবাসগুলি সব একসঙ্গে করলেও তার তুলনা হবে না। সে ছিল শৈলশহরদের তিলোত্তমা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য ও বিলাস, ফ্যাশনের প্রদর্শনী ও নির্জনতার ধ্যান সেখানে হাতে হাত মিলিয়ে চলত।

দার্জিলিং এর আর সেদিন নেই। বছর তিন চার আগে দার্জিলিং গেলাম। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে পুরনো রাস্তাঘাট আর কিছু খুঁজে পাই না। কার্ট রোড এবং তার ওপরে নিচে যে সব সমান্তরাল পথ ছিল তাদের দুপাশে খুব উঁচু উঁচু ঘরবাড়ি। পায়রারখোপের মত হোটেলঘর, ও বড় বড় সাইনবোর্ডে পাহাড় গাছপালা সব ঢাকা পড়ে গেছে। ওপরে তাকালে শুধু দেখা যায় সরু একফালি আকাশ। রাস্তার ধারে শুধুই দোকান। পণ্যসম্ভার দোকান ছাপিয়ে রাস্তার ওপর উপচে পড়েছে। সেখানেই চলছে দরদাম, বেচা কেনা, তর্কাতর্কি, এবং অসংখ্য মানুষের যাতায়াত। মূল দার্জিলিং শহর থেকে আর পাহাড় দেখা যায় না একথা শুনলে লোকে হাসবে, কিন্তু কথাটা খুব ভুল নয়। ভালো করে পাহাড় দেখতে হলে চলে যেতে হবে ম্যালের পিছন দিকে, অথবা শহর ছাড়িয়ে যেখানে চিড়িয়াখানা ও মাউন্টেনিয়ারিং ইন্স্টিট্যুট রয়েছে সেইদিকে। চিড়িয়াখানার নাতিউচ্চ টিলাটির ওপর দাঁড়িয়ে দূরে দার্জিলিং শহরের ঘনসান্নিবিষ্ট, স্তূপীকৃত নগরনির্মান দেখতে দেখতে সেদিন মনে হয়েছিল এত কংক্রিটের ভারে কোনদিন না শহরটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে।

স্বাধীনতার পর থেকে আস্তে আস্তে আমাদের সমাজ বদলেছে। বিশেষত: অনতিদূর অতীতে বিশ্বায়নের হাওয়া গায়ে লাগবার সময় থেকেই ছাপোষা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীও চাইছে জীবনটা যথাসাধ্য উপভোগ্য করে তুলতে। তাই আগে যাঁরা বেড়াবার কথা ভাবতেন না তাঁরাও এখন ভাবছেন। সরকারী অফিসগুলিতে কর্মীরা এ বাবদ কিছু সুবিধাও আজকাল পেয়ে থাকেন। এই সব নানা কারণে এদেশে টুরিস্টের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কাছাকাছির পাহাড় বলতে পুরনো তিনটি শহর দার্জিলিং কার্সিয়াং ও কালিম্পং আর যথেষ্ট নয়। তার ওপর এদের অপরিকল্পিত শ্রীহীন কলেবরবিস্তার অনেককেই বিমুখ করেছে। তাই চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক নিয়মে তৈরি হয়ে উঠেছে নতুন নতুন ভ্রমণবিন্দু। যা ছিল সামান্য পাহাড়ি গ্রাম তা হয়ে যাচ্ছে শৈলাবাস। সবগুলি এখনও সেজে ওঠেনি, ওঠবার পথে। আর তার চেয়েও বেশি আছে এমন অনেক ছোট ছোট জায়গা যেখানে ভ্রমনার্থী বা ভ্রমনব্যবসায়ী কারুরই এখনও নজর পড়ে নি।

হিমালয় সন্নিহিত এই ঘোমটা ঢাকা উত্তরবঙ্গ শহরে মানুষের ব্যবহারের জন্য এমনভাবে পুরোপুরি অনাবৃত হয়ে যাওয়া ভালো কি মন্দ, কিংবা কার কতটুকু ভালো কতটুকু মন্দ সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। পর্যটকের কাছে ভ্রমন দু দিনের বিলাস, আর পর্যটন ব্যবসায়ীর কাছে তা লাভজনক কারবার। কে না জানে ব্যবসায়ীর দৃষ্টি প্রকৃতি পরিবেশ মানে না, ভূমিপুত্রদের মঙ্গলামঙ্গলে তা অন্ধ, এবং অরণ্যকুসুম থেকে সমুদ্রজল সব কিছু বিষিয়ে দেবার ক্ষমতা তার আছে।

।। দুই ।।

অস্ত্যওরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নামঃ নগাধিরাজঃ। কাশ্মীর থেকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মাইলব্যাপী এই হিমালয় পর্বতমালা পৃথিবীতে অনন্য। এককালে এখানে ছিল সমুদ্র। ভূতাত্ত্বিকেরা এর স্তরে স্তরে সেই আদিম সমুদ্রের নানা চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। পর্বতের জগতে সে নবীন বয়সী, এখনও নাকি একটু একটু করে বাড়ছে। যৌবনের সৌন্দর্যে ভরপূর, মহাশক্তিধর, সততচঞ্চল এই নগাধিরাজ পূর্বপশ্চিমে দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে ভারতভূমিকে রক্ষা করছেন। তবু হিমালয় শব্দটি উচ্চারন করার সঙ্গে সঙ্গে যেখানকার ছবি মনে ভেসে ওঠে তা পূর্বহিমালয় নয়, পশ্চিমদিকের, বিশেষত: কুমায়ুন, গাড়োয়াল, কাশ্মীরের। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলকে বলা হোত দেবভূমি। বাতাস এখানে শীতল, আকাশ স্বচ্ছ, বৃষ্টি হলেও দৃষ্টিরোধকারী কুয়াশা স্থায়ী হয় না। আকাশ সুনীল ও রৌদ্রকরোজ্বল। এক এক রকম উচ্চতায় এক এক রকম গাছের বন। রানীক্ষেত অঞ্চলে দেখা যাবে মাইলের পর মাইল মর্মরিত পাইনবন। আবার আলমোড়ার একটু আগে পথ যেখানে দুভাগ হয়ে একটি আলমোড়া ও অন্যটি বিনসরের দিকে চলে গেছে সেখানে বসন্তকালে দেখেছি পাহাড়ের পর পাহাড় প্রস্ফুটিত রডোডেনড্রনে লাল হয়ে আছে। আবার গঙ্গোত্রীর পাহাড় অন্যরকম। সেখানে কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন ফেলা ললিত মাধুর্য নেই। সেখানে বলিরেখাঙ্কিত সুবৃহৎ সজীব পাষানস্তম্ভের মত দেবদারুগুলি সারি সারি সোজা দাঁড়িয়ে আছে। এত উঁচু যে মাথা পিছন দিকে অনেকখানি হেলিয়ে তবে তার শেষ দেখা যায়। শুধু কি গাছ! অসংখ্য নদী নিঝরিনাতে ভরা এই দেশ। প্রতিটি পথ, অন্ততঃ প্রধান পথগুলি সবই কোন না কোন নদীর ধার দিয়ে চলেছে। নদীই এখানে পথপ্রদর্শক। প্রতি নদীসঙ্গমে মন্দির, প্রতি পাহাড়চূড়ায় মন্দির। অতি ক্ষুদ্র সাদামাটা অনামা মন্দির এগুলি। হয়ত সেভাবে পূজা অর্চনা হয়ও না। হয়ত দিনান্তে পূজারী এসে একটি দীপ জ্বেলে যান শুধু। তবুও তা মন্দির। স্থানীয় অধিবাসীরা কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, দাবিদ্র্য সত্বেও রূপবান ও মিষ্টভাষী। অধিকাংশই প্রকৃতিতে সরল ও সংস্বভাব। এদেশ যে দেবভূমি তাতে সন্দেহ নেই।

এখানকার ইতিহাসও সেই কথাই বলে। কোন সুদূর অতীতে এখান দিয়েই পান্ডবেরা মহাপ্রস্থানে গিয়েছিলেন। গাইডরা দেখিয়ে দেবে পাণ্ডবেরা কোথায় কি করেছিল, মহাপ্রস্থানের পথই বা কোনটা? গল্পকথা ঠিকই; তবু এ পথের পবিত্রতা ও গৌরবের সংস্কারটি ভারতীয় মনে ওতপ্রোতভাবে গেঁথে আছে। যে সে এ পথে পা রাখবার অধিকারী নয়। পান্ডবদেরও মহাপ্রস্থানের পথে যাবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য আগে সারা ভারতভূমি প্রদক্ষিণ করতে হয়েছিল। কথিত আছে হস্তিনাপুর থেকে নির্গত হয়ে তাঁরা প্রথমে এসেছিলেন পূর্বভারতের সমুদ্রকূলে। তীর ধরে ধরে তাঁরা গিয়েছিলেন ভারতের দক্ষিণতম বিন্দুটিতে। যেখানে তিন সমুদ্র মিলিত হয়েছে সেখানে তীর্থস্নান করে ওঠবার সময় সমুদ্রদেবতা তাঁদের সামনে আবির্ভূত হন। এবং আসক্তি ত্যাগ করে যাবতীয় প্রিয়বস্তু জলে ফেলে দিতে আদেশ করেন। অর্জুন বাধ্য হন তাঁর গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণ বির্সজন দিতে। এরপর ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে উত্তরমুখে এসে তাঁরা পান সিন্ধু নদীকে। এবং সিন্ধুর গতিপথ ধরে চলে চলে অবশেষে উপনীত হন অসীম হিমপ্রান্তরে। মহাভারত ইতিহাস নয়, গল্পকথাই, তবু এ গল্প যাঁরা বানিয়েছিলেন ভারতভূমির ভুগোল যে তাঁদের ভালোই জানা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। পুরানকথা ছেড়ে যখন ইতিহাসে আসি তখন প্রথমেই যাঁর কথা মনে পড়ে তিনি অতীশ দীপঙ্কর। সেবার লাদাখে গেছি। সিন্ধু নদীর ধার দিয়ে শ্রীনগর থেকে লে পর্যন্ত যে পুরনো পথ তারই ওপর মাঝে মাঝে স্থাপন করা হয়েছিল অনেক বৌদ্ধবিহার, তীর্থপথিক শ্রমনেরা যাতে আশ্রয় পেতে পারেন সেইজন্য। সেইসব বিহারের যেখানেই গেছি শ্রমনরা একটি মূর্তি দেখিয়ে বলেছেন ইনি অতীশ দীপঙ্কর, ইনি এই বিহার স্থাপন করেছিলেন। কথাটি আক্ষরিক অর্থে সত্য না হওয়াই সম্ভব, কিন্তু একথা সত্য যে সেই মহাভিক্ষুর অনুপ্রেরনা বিহার প্রতিষ্ঠার মূলে কাজ করেছিল। প্রায় একই ধরনের ভূমিকা রয়েছে ভারতের হিন্দুতীর্থগুলির বিষয়ে শঙ্করাচার্যের। বৌদ্ধধর্মের প্লাবনের পর ভারতের শতধা বিদীর্ণ আর্যধর্মকে তিনি একটা নিয়মে গুছিয়ে তুলেছিলেন, কিন্তু কোনো শেকলে বাঁধেন নি। হিমালয়ের ভিতরে পরম সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি, তা সে যত দুর্গমই হোক না কেন, তিনি খুঁজে বের করেছিলেন, এবং সেগুলিকে তীর্থের গৌরব দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই পরম্পরা এখনও চলছে। গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী কেদারনাথ বদরীনাথ, কর্ণপ্রয়াগ রুদ্রপ্রয়াগ প্রভৃতি তো বটেহ, গঙ্গা যখন সমতলে নামছে সেই কনখল, ঋষিকেশ, হরিদ্বারও তাঁর কীর্তি ধারণ করে আমাদের ধর্মবোধ ও সৌন্দর্যচেতনাকে একই সঙ্গে চরিতার্থ করছে।

এই তো সেদিনের কথা যেদিন হরিদ্বার থেকে হাঁটা পথে প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় বা প্রবোধ কুমার সান্যালের মত লোকেরা পরিব্রাজক হয়ে ভ্রমণ করেছিলেন। অসহনীয় শারীরিক ক্লেশ সত্বেও তাঁরা কোথায় না গেছেন? গঙ্গা বা যমুনার উৎসরূপে যে গঙ্গোত্রী বা যমুনোত্রীর কথা সবাই জানে তাঁরা কেউ কেউ সে সবও পেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন যে জটাজটিল আদিম হিমবাহ এদেরও উৎস তার কাছাকাছি। নীলাভ চন্দ্রালোকে এক নজর দেখেছিলেন বন্দরপুঞ্ছ হিমবাহ থেকে যমুনার বিন্দু বিন্দু নিঃসরণ। সেখানকার ভয়াবহ শীতেও দিগম্বর গুহাবাসী দু একজন সাধুকে দেখেছিলেন যাঁরা কখনও লোকালয়ে আসেন না।

এরকম ঐতিহ্য গৌরবের ছিটেফোঁটাও পূর্ব হিমালয়ের নেই। উত্তমরূপে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিছু কিছু পর্বতারোহী এই অঞ্চলে অভিযানে গেছেন বটে, কিন্তু নিঃসম্বল তীর্থযাত্রার কোনো ইতিহাস পাই না। পুরাণকথায় উত্তরাঞ্চল যেমন দেবভূমি নামে চিহ্নিত ছিল, তেমনি এই অঞ্চলের নাম ছিল পিশাচভূমি। অবশ্য পিশাচ শব্দটির অর্থ তখন আলাদা ছিল। এখন মূল অর্থের অনেক অবনতি হয়েছে। সেকালে পিশাচ বলতে বোঝাত একধরনের পার্বত্য জাতি, প্রধানত: মঙ্গোলীয়। আসলে আদি আর্যেরা ভারতে ঢুকেছিল উত্তরপশ্চিম দিক দিয়ে। প্রথম থেকেই দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকদের সঙ্গে তাদের প্রচুর রক্তামিশ্রণ হয়েছিল। তাই তুলনামূলকভাবে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকেরা ছিল ঘরের লোক। অপর পক্ষে মঙ্গোলিয়ানরা ছিল খানিকটা অপরিচিত, এবং অপরিচিত বলেই রহস্যময়। এদের সম্বন্ধে কোনো নিন্দাবাদ তারা করেনি, বরং আর্য কবি গুনাঢ্য এদের ভাষায় বড্ড কথা (বৃহৎ কথা) নামক গল্প লিখেছিলেন। এদের যে বর্ণনা বিক্ষিপ্তভাবে সেকালের রচনায় পাওয়া যায় তা এই যে তারা পীতবর্ণ, মুদিত চক্ষু, খর্বকায়, বলিষ্ঠদেহ, সংযতবাক, এক জাতি, এবং বিবিধ তন্ত্র মন্ত্র ও অভিচারক্রিয়ায় সুদক্ষ তিব্বতি সংস্কৃতির সঙ্গে এ বর্ণনা পুরোপুরি মিলে যায়। বর্তমানকালে পূর্ব হিমালয়ের যারা ভূমিপুত্র তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপারটা বাদ দিলে তাদের সঙ্গেও মেলে। খাসিয়া, ভুটিয়া, লেপচা, গোর্খা ইত্যাদি নানারকম জনজাতি দ্বারা তারা গঠিত। কোন জনজাতি কত শতাংশ আছে, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানে কে কেমন, এদের সঙ্গে সমতলবাসীদের নৃতত্ব ও সাংস্কৃতিক তফাত কোথায়, এদের বর্তমান অশান্তির কারণ কি, এবং তাতে কার কী জাতীয় লাভ বা ক্ষতি হচ্ছে, সেইসব গুরুত্বপূর্ণ আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক বিষয় বর্তমান ভ্রমণবৃত্তান্তে থাকবে না।

।। তিন।।

শিলিগুড়ি থেকে একটি চওড়া রাস্তা সেবক পর্যন্ত এসে পূর্ব পশ্চিমে দুভাগে ভাগ হয়েছে। তারপর কিছুদূর গিয়ে এই দুই পথই প্রায় সমান্তরালভাবে উত্তরে চলে গেছে। পূর্বদিকের পথে বড় জায়গার মধ্যে পড়ে কালিম্পং ও গ্যাংটক। এই দুই প্রধান শহরকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট অসংখ্য টুরিস্ট স্পট তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে। নতুন পর্যটকদের আগ্রহ সেদিকে ক্রমবর্ধমান। পশ্চিম দিকের রাস্তাটি কার্সিয়াং দার্জিলিং এর পুরোন পথ। এ পথ থেকেও বহু শাখাপ্রশাখা বেরিয়ে নানা দিকে নতুন নতুন ভ্রমণবিন্দু তৈরি করেছে। সেবার আমরা এই পথেই যাচ্ছিলাম। আপাতত: আমাদের গন্তব্য কার্সিয়ং।

আমাদের দলটি ছোট। তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অগভীর এবং অল্পদিনের। এই ধরনের দলের সঙ্গে বেড়াতে বেরোবার কিছু অসুবিধা আছে। তবে সুবিধা এই যে ব্যবস্থাপনার দায় তাঁদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে নিরুদ্বিগ্ন একক ভ্রমণের সুখ পাওয়া যায়। কার্সিয়ং থেকে এঁরা কিভাবে কোথায় যাবেন তা আমি ঠিক জানি না, জানার জন্য উদ্বিগ্নও নই, কারন যেখানেই যান হিমালয়ের মধ্যেই তাঁদের গতিবিধি। সেখানে আমার চোখে সিঙ্গল যা তিনচুলও তাই। মনে মনে ভেবে বসে আছি স্থানটি যত অচেনা হয় ততই ভালো, কারণ তাতেই অটুট থাকবে তার নিজস্ব সৌন্দর্য।

শিলিগুড়ি থেকে শুকনা রংটং হয়ে উত্তরদিকে চলেছি। একটু বেলা হয়েছে। পরিষ্কার দিবালোকে চেনা জায়গা এমন অচেনা ঠেকছে কেন? অনেকদিন পরে আসছি বলেই কি? মনে আছে এ অঞ্চলে মাইলের পর মাইল ঘন সবুজ চা বাগান ছিল। অল্প বয়সে এখানেই প্রথম হেলিকপ্টার দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেকালে ঐ আকাশযানটি দুর্লভদর্শন ছিল। মনে আছে টয় ট্রেনে দার্জিলিং যেতে যেতে চা বাগানের ওপর এক দ্রুত সঞ্চরমান বিশাল ছায়া দেখে কৌতূহলী হয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি গর্জনশীল এক অতিকায় পতঙ্গের মত আকাশযান ঘুরে ঘুরে চা বাগানের ওপর কীটনাশক ছড়াচ্ছে। এরই নাম হেলিকপ্টার। বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না সেদিন। এখন ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করি চা বাগান কই? সে আধ ফাঁকা খেতের মধ্যে গুল্মাকৃতি ছোট ছোট ঝোপগুলিকে দেখিয়ে বলে ঐ তো চা বাগান। দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এইসব সংক্ষিপ্ত চা বাগানের মাঝে

মাঝে পতিত জমি, কলকারখানার শেড, ছোট বড় জনবসতি, লরি গুদাম, ইঁটের পাঁজা, আর প্রায়ই স্তূপাকার করে কেটে রাখা কাঠ। অদূরবর্তী অরণ্যের বুক খালি করে এগুলি আনা হয়েছে। এই এক দৃশ্য আজ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে ডুয়ার্স পর্যন্ত যেখানে যাই সেখানেই। পরিবর্তে নতুন বনসৃজনের নামে কোথাও কোথাও লাগানো হয়েছে ইউক্যালিপটাস নামক এক অসার গাছ, যার না আছে ছায়া, না আছে ফুলফল, অথচ ভুস্তরের জল শোষণ করে নিতে যা অদ্বিতীয়।

এসে গেল পাহাড়। গাড়ি এবার ক্রমশ : ওপরদিকে উঠছে। যেখানে যত পাহাড়ি পথ আছে সকলের মধ্যেই একটা মিল এই যে এ পথের একদিকে থাকবে ক্রমোচ্চ পর্বত, এবং অন্যদিকে খাদ। পশ্চিম হিমালয়ের পর্বতগুলি সব নদী অববাহিকা ধরে তৈরি হয়। পূর্ব হিমালয়ে কিন্তু অত নদী নেই। দু দশটা ঝর্না ও ঝোরা আছে বটে তবে তা দার্জিলিং এর ভূতপূর্ব পাগলা ঝোরার মত শীর্ণ শুষ্ক এবং ক্রমবিলীয়মান। এখানকার খাদের দিকে তাকালে যা চোখে পড়ে তা ঘন বন। এত কাঠ কেটে নেবার পরেও এখনও নিশ্ছিদ্র সবুজ। সড়কের পাশে পাশে চলেছে সরু রেলপথ। ছোট ছেলেদের দম দেওয়া খেলনার মত একটি রেলগাড়ি কিছুদূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে বাঁকের আড়ালে হারিয়ে গেল। অতীতের তুলনায় টয় ট্রেনের গতি দেখলাম কিছু বেড়েছে। আগেকার দিনে এই টয় ট্রেনে যাবার সময় অভিজ্ঞ যাত্রীরা নতুনদের সাবধান করে দিত ঘড়ি গয়না বা সানগ্লাস সামলে রাখতে; কারণ অতি মন্থর ট্রেনের পাশে চলতে চলতে চতুর ছিনতাইবাজরা কখনো কখনো তা হাতিয়ে নিত। এবারে গাড়ির যে গতি দেখলাম তাতে ট্রেনের পাশে হাঁটতে হাঁটতে হাত সাফাই বোধহয় আর সম্ভব হবে না। এই পথের ধারে অতীতে প্রচুর বন্য ফুল ফুটে থাকত, এমন কি অর্কিডও। এবারে অবশ্য পথের পাশে ফুল ফুটে নেই। পর্যটকের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে প্রকাশ্য স্থানে হাতের নাগালের মধ্যে ফুল ফল পাওয়া দুষ্কর। ফুল যদি আজ ফুটেও থাকে সে আছে লোকচক্ষুর অন্তরালে গহন উপত্যকার অন্দরমহলে।

কার্সিয়ং এসে গেল। মোটামুটি বড় শহর এবং অপেক্ষাকৃত পুরনো শহর। এখানে এককালে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের নিজস্ব বাড়ি ছিল। এবং এখানকার দৃশ্যাবলী নিয়ে গগনেন্দ্র অবনীন্দ্রের অনেক ছবিও আছে। এখন বেলা প্রায় দুপুর, কিন্তু ঘন মেঘে আকাশ ঢাকা বলে মনে হচ্ছে যেন সবে ভোর হল। মার্চ মাস হলেও কনকনে শীত। সম্ভবত: আবহাওয়ার জন্যেই। ঘোলাটে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত পর্দা ফেলা কুয়াশা। কুয়াশার ভিতর দিয়ে দূরের পর্বতমালা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ধূমল, হালকা নীল, হালকা সবুজ বিবর্ণ সাদা এইসব কাছাকাছি রংগুলি যেন পরস্পরের এলাকায় ঢুকে পড়ে আবছায়া পর্বতমালা এঁকে রেখেছে। এক পাহাড়ের পেছনে আর এক পাহাড়ের সারি। পাহাড়গুলি যেন কোনাকুনি করে একে অপরের গায়ে হেলানো। ঠিক যেন গগনেন্দ্রনাথের আঁকা হিমালয় চিত্রাবলী। গাড়ি শহরে ঢুকে গেছে। ঘরবাড়ি, দোকান, পথচারী, মানুষ, আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত পাহাড়ি বালক বালিকা, গোলাকার মুখে চোখমুখের ছোট ছোট তিনটি ফুটকি বসানো পাহাড়ি শিশু, ঠিক যেন অবনীন্দ্রনাথের অ্যালবাম থেকে উঠে এল।

সাধারনত: পাহাড়ি শহরগুলির বাজার ও সন্নিহিত জনবসতি অঞ্চল আমাদের দেশে যৎপরোনাস্তি নোংরা ও ঘিঞ্জি। পাহাড়ের শোভা বুঝতে গেলে উঠতে হয় সবচেয়ে উঁচুতে অথবা যেতে হয় শহর ছাড়িয়ে বাইরে। কার্সিয়ংও তার ব্যতিক্রম নয়। বিশেষত: পর্যটনব্যবসায়ে সাম্প্রতিক উন্নতির ফলে ক্রমাগত হোটেল ও লজের সংখ্যা বাড়ছে। ভালো হোটেলগুলি সবই মূল রাজপথ থেকে ওপর দিকে। আর মূল পথের দুপাশে অসংখ্য দোকান। ফুটপাথ বলে কোনো জিনিস নেই। রাস্তা যতখানি চওড়া তার থেকে গাড়ির সংখ্যা বেশি। পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝেই গাড়িচাপা পড়ার থেকে বাঁচবার জন্য দোকানঘরের ভেতরে ঢুকে পড়তে হয়। তার ওপর সেদিন টিপ টিপ বৃষ্টিতে পথ ছিল পিছল। পাহাড়ি পথ হলেও স্থানে স্থানে কাদা জমছে। মাঝে মাঝে নিচের দিকে যেসব শাখা পথ নেমে গেছে সেগুলি ততোধিক কর্দমাক্ত, নোংরা, ও ঘনসন্নিবিষ্ট ঘরবাড়িতে বুকচাপা। অতীতে হয়ত এখানে কাঠের বাড়ি ছিল, কিন্তু বর্তমানে ছোট বড় সব বাড়িই ইঁট সিমেন্ট কংক্রিটে তৈরি। অপরিকল্পিত ও অসুন্দরভাবে প্রায় প্রতিটি বাড়িই কলেবর বাড়াচ্ছে। ঘেঁষাঘেঁষি এই সব বাড়িতে পয়েরাখোপের মত শুধু মাথা গোঁজবার জায়গাটুকুই আছে। আর কিছু নেই। না আছে উঠোন, না আছে বাগান, না আছে দুটো গাছপালা। ঘরে ঘরে কিলবিল করছে মানুষ। জানালার নিচেই আঁস্তাকুড়। সেখানে উড়ছে পেঁয়াজের খোসা। মুরগির পালক। নানা রকম রান্নাবান্নার মিশ্র গন্ধে বা দুর্গন্ধে বাতাস ঘন, যেন সেটাও এই সাদা পর্দাটানা কুয়াশার অঙ্গ।

কার্সিয়ং বড় শহর হলে সব রকম দোকানপাটই আছে। বই কাগজ সিডি ক্যাসেটের ঝকঝকে এক দোকানে ঢুকলাম। দার্জিলিং জেলার কোনো ম্যাপ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে দোকানি অনেক খুঁজেপেতে একটা ভারতবর্ষের ম্যাপ এনে দিল। আর কিছু নেই? না, নেই। দু পা এগিয়ে সরকারি পর্যটন দপ্তরের অফিস। তার পাশেই একটা বেসরকারি ভ্রমণসংস্থার অফিস। পর্যটন দপ্তরের অফিসে কেউ নেই। ভ্রমণসংস্থার অফিসে একটি স্থানীয় ছেলে বিরসবদনে বসে আছে। এ অঞ্চলের কোনো ম্যাপ বা লিফলেট পাওয়া যাবে? ও সব আমরা রাখি না। আপনাদের কাজ কি? আমরা টুরিস্টদের কন্ডাক্টেড টুরে নিয়ে যাই। যে সব জায়গায় নিয়ে যান তার কোনো রোডম্যাপ আছে? ম্যাপের কী দরকার! আমাদের লোক সব রাস্তাঘাট চেনে। এমন সময় দরজার কাছ থেকে আর একটি ছেলে তাকে কী যেন বলল। সে তৎক্ষনাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে, বেরিয়ে, তাকে নিয়ে ঢুকে গেল পাশের রেস্টুরেন্টে। সেখানে তখন জমজমাট ভিড়। নানা রকম সুখাদ্যের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। এই হল পশ্চিমবঙ্গে পর্যটনের হাল। খুব দুঃখের সঙ্গে মনে এল আর একটা ঘটনা। কয়েক বছর আগে মুনসিয়ারিতে গেছি। মার্চের প্রথম দিক, পথে ঘাটে তখনও বরফ রয়েছে। টুরিস্ট সিজন্ তখনও ঠিকমত শুরু হয় নি। বাজারের মধ্যে ছোটখাট একটা বইয়ের দোকানে দেখে সেখানে স্থানীয় ম্যাপের খোঁজ করাতে উত্তরাঞ্চল প্রদেশের একটা বেশ বড় সাইজের ম্যাপ বার করে দিল। দিয়ে, একটু কুণ্ঠিতভাবে বলল ইংরিজিটা এখনও আসেনি, এটা হিন্দি ম্যাপ। আমাদের দেখে সে বুঝেছে এরা হিন্দিভাষী নয়, হিন্দি অক্ষর নাও বুঝতে পারে। সেজন্য সে ক্ষমাপ্রার্থী। টুরিস্টদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা এবং তাদের চাহিদার খোঁজ রাখা যে পর্যটননির্ভর অঞ্চলের স্বার্থরক্ষার জন্যই জরুরি একথা পশ্চিমবঙ্গ কবে বুঝবে? অথচ উত্তরাঞ্চলে গিয়ে কুমায়ুন মন্ডল বিকাশ নিগমের প্রতিটি অফিসে দেখেছি ঘরের দেওয়াল জোড়া রিলিফ ম্যাপ। সেখানে প্রতিটি শৃঙ্গের অবস্থান ও উচ্চতা পরিস্কারভাবে দেখানো আছে। শুধু ম্যাপ বা লিফলেট নয়, বিক্রি হচ্ছে ধারাবিবরনী সংবলিত ভিডিও সিডি ও ক্যাসেট।

যাই হোক পরের দিন কার্সিয়ং আর আমাদের হতাশ করল না। ভোরে দেখি বৃষ্টি আর নেই। অল্প অল্প রোদ উঠছে। আমাদের গেস্ট হাউসটি মূল রাস্তার নীচে বলে এর পরিবেশ যারপরনাই অসুন্দর। তবু গেস্ট হাউস বলেই বোধহয় তার একচিলতে উঠোন আছে; আর সেই উঠোনের একপ্রান্তে, কেয়ারটেকারের ঘরের পাশে গর্বিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে একটি রক্ত পলাশ। গাছটি এখনও কচি, তবু তারই মধ্যে তার সমস্ত ডালপালা ঝেঁপে ফুল ফুটে উঠেছে। উপরে ইলেকট্রিক তারের জঙ্গল, পায়ের কাছে জঞ্জালের স্তূপ। তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে রক্তপলাশ বসন্তকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। কুয়াশার ঘেরাটোপ এখন প্রায় নেই, সূক্ষ্ম সাদা পর্দার পিছন দিকে আলো পড়লে যে একটি জ্যোতির্ময় শুভ্রতা তৈরি হয় বায়ুমন্ডলে এখন সেই শুভ্রতা। ক্রমে তাও মিলিয়ে গেল। রাস্তা দিয়ে দলে দলে বালক বালিকা স্কুলে যাচ্ছে। রাস্তার ওপারে উঁচু টিলার ওপর একটা বড় মিশনারি স্কুল। যেখানে ঘন্টা বাজল। শোনা যাচ্ছে ছেলেদের প্রার্থনাসঙ্গীত। ঝিক ঝিক করতে করতে মস্ত বড় পোকার মত একটা টয় ট্রেন যাচ্ছে। আমরা শহর এলাকা ছাড়িয়ে উপকণ্ঠে পৌঁচেছি। এখানে চারিদিক ফাঁকা ফাঁকা, পরিচ্ছন্ন, আদৌ ঘিঞ্জি নয়। দূরে দূরে বাংলো প্যাটার্নের ছোট বড় কিছু বাড়ি আছে। তাদের কাঠের রেলিং ঘেরা বারান্দা, টবে মরসুমি ফুল।

এখন আর কোনো ঘরবাড়ি নেই। উপরে ও নীচে ঢালু হয়ে উঠে যাওয়া ও নেমে যাওয়া পাহাড় ও পাইনবন। এখানকার এই পাইনবন রানীক্ষেতের পাইনবনের মতো নয়। উদ্ভিদবিজ্ঞানে নিশ্চয়ই এদের আলাদা আলাদা নাম আছে। আমরা অজ্ঞ লোকে এই মন্দিরাকৃতি সরল কাণ্ডযুক্ত গাছগুলিকে সাধারনভাবে পাইন বলেই উল্লেখ করি। রানীক্ষেতের পাইনবন বলতেই চোখে ভাসে ঘননীল আকাশপটে ছবির মত সারে সারে ফাঁকা ফাঁকা করে সাজানো সোজা সরল গাছ। কাঁচা সবুজ তাদের রঙ। তার চেয়েও কাঁচা, সবুজ, নরম, মসৃণ, কচ্ছপের পিঠের মত ঈষৎ ঢালু, ঢেউ খেলানো সেই ভূমি যেখানে তারা জন্মেছে। এত পরিস্কার যে মনে হয় ঝাঁট দেওয়া। হয়ত ক্যান্টনমেন্ট শহর বলেই এত টিপটপ। তবে তা না হলেও আর এক রকমের পরিচ্ছন্নতা আছে বা মানুষের চেষ্টায় লভ্য নয়। যা নৈসর্গিক, রানীক্ষেতের পাইনবনে সেইটা আছে। শুধু রানীক্ষেত কেন, পিথোরাগড়, মায়াবতীর দেবদারুবনেও একই দৃশ্য দেখেছি। সুশৃঙ্খল গাছগুলি সোজা উঠে আকাশ ছুঁয়েছে, শাখাপত্রে চন্দ্রাতপ রচনা করেছে। কিন্তু সেই চন্দ্রাতপ আকাশ ঢাকেনি। মাটিতে তাই আলো ছায়ার বুননী নকশা তার ওপর কোনও ময়লা কুটো কাটি পড়ে নেই। আসলে ঢালু পাহাড়ে প্রবল হাওয়ায় শুকনো পাতা ও কুটো আপনিই উড়ে নিচের দিকে গড়িয়ে যায়। তাছাড়া সেইসব সুদূর অঞ্চলে সভ্য মানুষের তৈরি আবর্জনাও অনেক কম।

এখানে এই পূর্বদেশের অরণ্যভূমি তেমন নয়। একে তো এদেশে লোকসংখ্যা বেশি; অল্প দূরে দূরেই গ্রাম, এবং প্রচুর টুরিস্ট। তার ওপর পূর্বদেশের বাতাস স্যাঁতসেঁতে,

জলীয় বাষ্পে ভরপুর। এখানে বৃষ্টি বেশি, কুয়াশা বেশি, শুধু বেশি নয় একটানা একঘেয়ে। ফলে গাছপালার স্বাভাবিক বাড় খুব বেশি। জঙ্গল এখানে ঘন। বড় বড় গাছগুলি মাথায় মাথায় মিলে যে আচ্ছাদন তৈরি করেছে তার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো তেমনভাবে ঢোকে না। ফলে মাটি লতাগুল্ম কীট পতঙ্গে সমাচ্ছন্ন। বড় গাছের ওপর কত রকমের পরগাছা যে এখানে দেখা যায়! হয়ত তারই মধ্যে লুকয়ে আছে দুর্লভ অর্কিড। কোথাও কোথাও গাছের গুঁড়িগুলি ঘন সবুজ কালচে শেওলায় ঢাকা। কোথাও বা মূল কাণ্ড থেকে ডালপালা বেরোবার গ্রন্থিস্থলে ধূসর রঙের লোমশ পশুর মতে ঝুঁপাসি শিকড়বাকড় ঝোলানো একরকম উদ্ভিদ জন্মেছে। এ বনে ঝর্নার কলশব্দ খুব একটা শোনা যায় না। মাঝে মধ্যে দেখা যায় ওপরের পাহাড় থেকে নাতিপ্রশস্ত জলধারা ঝির ঝির করে বয়ে এসে রাস্তা ভিজিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। পূর্ব অভিজ্ঞতায় জানি এ বন নিঃশব্দ নয়। এক ধরনের ঝিঁঝির মত পতঙ্গ আছে (বা ছিল) যারা সেতার বাজনার মত অতি ধীর লয়ে ডাক শুরু করে ক্রমশ: গতি বাড়াতে বাড়াতে দুগুন চৌগুনে গিয়ে ঝপ্ করে থেমে যায়। আবার গোড়া থেকে ডাকতে শুরু করে। আপাতত: আমরা কাঁচ তোলা বন্ধ গাড়ি করে যাচ্ছি বলে বাইরের কোনো শব্দ আমাদের কানে ঢুকছে না। দেখতে দেখতে পরবর্তী লোকালয় এগিয়ে এল, বাঁকের মুখে দেখা হচ্ছে উল্টোদিকের গাড়ির সঙ্গে, চালকে চালকে দুর্বোধ ভাষার বাক্যবিনিময় হচ্ছে। দু একটা ঝুপড়ি দোকান, ঘরবাড়ি, কাঠের ঝোপ মাথায় নিয়ে পাহাড়ি শ্রীপুরুষ, দেবস্থানের চত্বরে শিশুরা খেলছে। এসে গেল আর একটা ভয়ানক ঘিঞ্জি বাজার এলাকা।

আমাদের বর্তমান দলে কারও কারও কার্সিয়ং সম্বন্ধে অনেক আগ্রহ ছিল। হয়তো চেনাশোনা লোকও ছিল। সেজন্য দুদিন এখানে থাকা হয়েছে। এবার অন্য গন্তব্য। কোনো এক রহস্যময় কারণে আমাদের ভ্রামনিক দলপতিরা তাঁদের পরিকল্পনাটি পুরোপুরি খুলে বলেন নি, কিংবা হয়ত তাঁরা নিজেরাই জানতেন না। পরে বুঝেছি তাঁরা তাঁদের পূর্বতন চাকুরির পদগৌরবে যেখানে যেখানে সুযোগসুবিধা পাবেন সেইরকম জায়গাগুলিই নির্বাচন করেছিলেন। আপাতত: আমরা যাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে রাম্মাম নামক একটি নামক একটি অখ্যাত অঞ্চলে। যাচ্ছি বিদ্যুৎ পর্ষদের নিজস্ব বাসে। কারন ওদিকে কোনো নিয়মিত পরিবহন নেই। কোনো রুটের বাস ওখানে যায় না। একেবারেই যোগাযোগবিচ্ছিন্ন অঞ্চল বলে প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। কারন তা হলে তাগে ফিরতি পথের ভাড়াটাও দিতে হবে এবং সেটা অসম্ভব রকম বেশি। যাতায়াত জন্য পর্ষদের নিজস্ব গাড়ী শিলিগুড়ি থেকে সপ্তাহে দু দিন যায়। দু দিন আসে। কর্মীরা ইচ্ছা করলে তাঁদের পরিচিত দু চার জনকে সঙ্গে নেন। সেই ভাবেই আমাদের নিয়েছেন। পর্ষদের নিজস্ব গেষ্ট হাউস আছে। আমরা সেখানেই থাকব।

কার্সিয়ং থেকে ঘুম পর্যন্ত বহুবার যাওয়া চেনা পথ এবং চেনা আবহাওয়া। সকালে যখন বেরোলাম তখন আকাশে নিষ্প্রভ রোদ ছিল। কিন্তু এখন যত এগোচ্ছি ততই ঘন মেঘ বা কুয়াশা চারিধার থেকে চেপে ধরছে। গাড়ি চলছে তাই খুব আস্তে আস্তে। দিন দুপুরে জ্বালাতে হয়েছে হেডলাইট। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে যতবার ঘুমের ওপর দিয়ে গেছি ততবারই এইরকম হয়েছে। কখনো এদেশে রোদ্দুর দেখিনি। রাত্তিরবেলার অন্ধকারের রং কালো, আর এ যেন দিনের বেলার সাদা অন্ধকার। মনে হচ্ছে যেন একটা সাদা গুহার মধ্যে দিয়ে চলেছি। অবশেষে ঘুম বাসস্ট্যান্ডে গাড়ি থামল। অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি কাছের দৃশ্য। একদিকে এখানকার বিখ্যাত মনাস্টারির সিংহদ্বার, অপর পাশে ছোট্ট একটি কাঠের বাড়ি। রেলিং ঘেরা বারান্দায় ছোট ছোট কাঠের টবে গাঁদাফুল ফুটে আছে অদূরে কিছু দোকানপাট ও গাড়ি। ঘুম জায়গাটি গুরুত্বপূর্ণ, কারন এখান থেকে পথ ভাগ হয়ে নানা দিকে গেছে। অনেক যাত্রীকে এখানে গাড়ি বদল করতে হয়। সে তুলনায় জায়গাটি একটু জনবিরল। সব যেন ঝিমিয়ে আছে। হয়ত আবহাওয়াই এর কারন। ঘুম যে এক সার্থকনামা দেশ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঘুম থেকে আমরা পশ্চিমমুখে নতুন পথ ধরলাম। এইবার আবহাওয়া পাল্টাতে শুরু করেছে। কুয়াসা খানিকক্ষণ ধরে বৃষ্টিরূপে গলে গলে পড়তে লাগল। তারপর মেঘ ফাঁক হয়ে গিয়ে ক্রমে স্পষ্টতর ও দীপ্যমান হতে লাগল পাহাড়পর্বত। আমরা এখন ক্রমাগত চড়াইপথে উঠছি। পাহাড়পথে ওপরদিকে যাবার একটা আলাদা অনুভূতি আছে। নিম্নমুখী গাড়ি সবসময়েই তাকে পথ ছেড়ে দেবে এটাই আইন। আমরাও তাই উল্টোদিকের গাড়িকে পথের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে গর্বিতভাবে চলে যাচ্ছি। গাড়ির চাকায় চাকায় কেমন একটা চাপা গুম গুম শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনেক নীচে উপত্যকায় একটুখানি চাষের ক্ষেত, সরু একটি জলধারা, খেলনার মত বাড়ি, দু একটা পুতুলের মত মানুষ। দেখতে দেখতে তা মিলিয়ে গেল। এখন দুপাশেই ঘন বন। সরল কাণ্ডযুক্ত বড় বড় গাছের এক ধরনের ফার্ন গাছ জন্মেছে। চারিদিকেই তাদের দেখতে পাচ্ছি। কী বড় এক একখানা পাতা। পাতাগুলি সরু লম্বা চিকরিকাটা, পাহাড়ের গাছে ঝুলে রয়েছে আর দুলছে, যেন আদিম যুগের কোনো অতিকায় পতঙ্গ শুঁড় নাড়ছে। ছায়ার মধ্যে ঘন সবুজ গাছকে মনে হচ্ছে যেন দোয়াতের কালির মত মলিন কালো। এই লতাজটিল অরণ্যে দিনেও অন্ধকার।

এই সব অঞ্চলে অতীতে জনবসতি খুব কম ছিল। এখন আর তা নয়। কিছু দূরে দূরেই লোকালয় আছে। পুরনো গণ্ডগ্রামগুলি ক্রমাগত শহরের আকার নিচ্ছে। সুখিয়াপোখরি নামের একটা ছোট শহর। নামটা চেনা চেনা ঠেকছে যেন। মনে পড়ছে এই নাম দেখেছি সমরেশ মজুমদারের উপন্যাসে। সেই কাহিনীতে বিপ্লবী যুবকেরা এখানকার তুষারাবৃত পাহাড়ে আদিবাসীদের কুঁড়ে ঘরে আত্মগোপন করে থাকত। গভীর রাতে চাঁদের আলোয় যখন চারিদিক থমথম করছে তখন তারা, দূরে পাহাড়চূড়ার দিক থেকে শুনেছিল ইয়োতির ডাক, এবং বরফের ওপর দেখেছিল তার বিশাল পদচিহ্ন। তার বদলে এখন আমরা দেখছি অপরিসর অমসৃণ রাস্তায় অসংখ্য ছোট বড় গাড়ি হর্ন বাজিয়ে পরস্পরকে পথ দিতে বলছে, এবং কেউই তা শুনছে না। বাজার এলাকাটি খুবই ছোট, কিন্তু সে তুলনায় অনেক দোকান রয়েছে। দোকানগুলির ধূলিমলিন শ্রীহীন চেহারা। আলু পেঁয়াজ বাঁধাকপি থেকে চাল ডাল তেল নুন লজেন্স বিস্কুট সবই সেগুলিতে বিক্রি হচ্ছে। মালার মত ঝুলছে সাবান শ্যাম্পু চিপস কুরকুরের রঙিন প্যাকেট। আদিম অরণ্যের গা ঘেঁষে থেকেও এ দেশ আধুনিক সভ্যতার সব কটি চরিত্রলক্ষণ অঙ্গে ধারন করেছে। ওরই মধ্যে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখে একটা ভোজনালয়ে ঢোকা গেল। দোকানদার নেপালি। বাড়িতেই দোকান দিয়েছে। এখানে সকলেই তাই। এরা স্বামী স্ত্রী মিলে দোকান চালায়। মোটামুটি শিক্ষিত স্বচ্ছল এবং বুদ্ধিমান। কী করে ব্যবসা করতে হয় তা জানে। এদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু সঙ্গে থাকে না। তারা কার্সিয়ং কালিম্পং এর বোডিং স্কুলে থেকে লেখাপড়া শিখছে। পাহাড়ের এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেনীটি ক্রমশ: শক্তিশালী হচ্ছে। ছোট ছোট শহরে তো বটেই দার্জিলিং কালিম্পং এর মত বড় শহরেও এরা মারোয়াড়ি বনিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যবসা করে। তাদের জাতিচেতনা খুব উগ্র, এবং সে চেতনা গরিব পাহাড়ি জনসাধারনের মধ্যে চারিয়ে দিতে এরা সচেষ্ট। তাই এই সুদূর প্রত্যন্ত গ্রামেও দেখছি টেলিভিশনের রিয়ালিটি শোতে জনৈক স্বজাতি যুবককে এস. এম. এস করে জেতাবার জন্যে ছাপা পোস্টারের মালা বাসস্ট্যান্ডে ঝুলছে।

আমাদের রাম্মামগামী বাস যখন চড়াই ছেড়ে উৎরাই ধরল তখন বিকেল হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ আর কোনো লোকালয় পাই নি, গাড়ি এবার ঘুরে ঘুরে কেবলি নীচের দিকে নামছে। পার্বত্য অঞ্চলে উপত্যকা যদি চওড়া হয় তাহলে অনেকখানি অনাবৃত আকাশ পাওয়া যায়, অনেকক্ষন ধরে ভোগ করা যায় সূর্যাস্তের আলো। কিন্তু উপত্যকা যেখানে সংকীর্ন সেখানে খাড়াই পথে ঘন বন দুদিক থেকে চেপে আসে। ওপরে সরু একফালি আকাশ মাত্র দেখা যায়। আমরা সেইরকম বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। বাসের মধ্যে অকালসন্ধ্যা নেমে এসেছে। শীতও কমেছে। আশ্চর্যের বিষয় কিছুদূর এইভাবে যাবার পর মনে হল অন্ধকার যেন পাতলা হয়ে যাচ্ছে। দিনের আলো উজ্জ্বলতর হল। এমন তো হবার কথা নয়, ভালো করে দেখে বুঝলাম বাইরের বন এখন অনেক ফাঁকা ফাঁকা। বাসের যাত্রীদের মধ্যেও একটা উসখুস ভাব। এতক্ষন তারা বিরসবদনে আসছিল। অধিকাংশই বিরাজ করছিল নিদ্রা ও জাগরনের মধ্যবর্তী একটা ত্রিশঙ্কু অবস্থায়। এখন তারা সকলেই সচেতন হয়ে উঠে জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। ঠিক তখনই অস্তমিত সূর্যের আলোয় লাল হয়ে থাকা পশ্চিম দিগন্তে যে দৃশ্যটি ফুটে উঠল মন তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। দিগন্তে একটা বড় টিলা জুড়ে সারি সারি ডালপালা কেটে ফেলা বৃক্ষকান্ড। আগুনরঙা আকাশপটে তাদের নগ্ন দেহরেখা সারি সারি প্রেতের মত দেখাচ্ছে। যে যে সন্ধিস্থল থেকে প্রশাখাগুলি উদগত হয়েছিল সেই অমসৃণ জায়গাগুলিকে মনে হচ্ছে কাঁটা বিঁধিয়ে রাখা। ডালপালা কাটা হয়ে গেছে। এবার এদের পালা শুধু ট্রাক আসার অপেক্ষা। পথ এখানে পাকা এবং ভালো। বিদ্যুৎবাতি আছে। মাঝে মাঝেই পাশে স্তূপীকৃত হয়ে আছে স্টোন চিপ্‌স ও অন্যান্য ইমারতি দ্রব্যসামগ্রী। মাঝে মাঝেই পাওয়া যাচ্ছে এক একটা করোগেট টিনে ছাওয়া পাঁচিলঘেরা গুদাম ঘরের মত ঘর। বন্ধ কালভার্টের ভেতরে প্রবল শব্দে ঝরে পড়ছে জল। ড্যাম সাইট এসে গেল। একজন দুজন করে লোক নামছে। এখন অন্ধকার। নীচে কিছুদূরে পুরনো রাম্মাম গ্রাম। দীপাবলীর মত সেখানে অনেক আলোর ফুটকি দেখা যাচ্ছে। বাকি লোকেরাও নেমে গেল। তখন বাস এসে দাঁড়াল বাহারি পাঁচিল ঘেরা, কম্পাউন্ড ওলা একটা মাঝারি আকারের দোতলা বাড়ির সামনে। এটাই রাম্মাম গেস্টহাউস, আমাদের গন্তব্যস্থল।

সারা দিনের পিঠ টান করে ঘেঁষাঘেঁসি বসা বাসযাত্রার পর ক্লান্ত আমরা। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়া গেল। ঘরের ব্যবস্থা মন্দ নয়। তার ওপর অতিথিদের খাতিরে

রুমহিটার জ্বালিয়ে রেখে গেছে। হিটার ব্যবহারের মত বড় শীত কিন্তু আজ নয়। তাছাড়া আধুনিক আর পাঁচটা হোটেলের মত এখানেও জানলাগুলি স্থায়ীভাবে সেঁটে দেওয়া। পাল্লা খোলবার কোনো উপায় নেই। কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি একটা মরা আলো পাহাড় জঙ্গলের ওপর বিছিয়ে রয়েছে। দেখা যাচ্ছে ঝুপসি ঝুপসি গাছের দেহরেখা। নিচে গেষ্টহাউসের পিছনের উঠোন। সেখানে গোটানো তার, ভাঙা বালতি, ওলটানো ঝুড়ি প্রভৃতি পদার্থ। ঘরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তিকর বিজাতীয় গন্ধ। একটু পরে ঠাহর হল গন্ধটা কিসের। হয়ত আমাদের আগেই কোনো প্রমোদপিপাসু দল এখানে রাত্রিযাপন করে গেছে। এ তাদের অস্তিত্বের রেশ। সব মিলিয়ে রাত্রিটা ভালো কাটল না। শীতের দেশে ক্লান্ত শরীরে উষ্ণ ঘরে উষ্ণ শয্যায় যে সুখকর তন্দ্রাটি আসবার কথা তা এল না, আবার নতুন দেশে এসেছি, সকালে উঠে দেখব অজানা আকাশের নীচে অচেনা ভূমি, সেই সুখকর উত্তেজনাটিও এল না। আবিল ঘুমের মধ্যে কেবলি হানা দিতে লাগল লাল আকাশের গায়ে প্রেতের মত কালো শাখাপত্রহীন গাছ। টানেলের বন্ধ গুহায় বন্দী নদীর অবিশ্রাম ঝরে পড়া আর্তনাদ।

অবশেষে সকাল হল। পশ্চিমাকাশে এখনও চাঁদ আছে, পূর্বাকাশে এখনও সূর্য ওঠেনি। কিন্তু একটি পেলব গোলাপি আভা বুঝিয়ে দিচ্ছে আজকের দিনটি হবে রৌদ্রকরোজ্বল। একটি টিলার ওপর আমাদের পূবমুখী গেষ্ট হাউস অবস্থিত। এখান থেকে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। নীচে রাম্মাম গ্রামটি বোঝা যাচ্ছে। আর এখানকার সম উচ্চতায় এপাশে ওপাশে দূরে কাছে অল্প কিছু পাকা বাড়ি দেখছি। ওর মধ্যে আছে স্টাফ কোয়ার্টার, অফিসঘর, এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মূল মেশিনারি। ইতিমধ্যে বেলা বেড়েছে। কলকাতার লোকেদের আগমনসংবাদে স্টাফ কোয়ার্টার থেকে কেউ কেউ চলেও এসেছেন। আজ দোলের দিন, অনেকের ছুটি। যদিও মেশিনঘরের কাজ চব্বিশ ঘন্টার, সেখানে কাজ হচ্ছে। ছুটি পাওয়া কর্মীরা কেউ কেউ উৎসাহভরে প্রস্তাব করলেন তাঁরা আমাদের এই প্রজেক্ট এবং সন্নিহিত অঞ্চল ঘুরিয়ে দেখাবেন।

আমাদের পক্ষে খুবই লোভনীয় প্রস্তাব সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁরা দেখাবেন তাঁদের কাছেও কি তাই? শুধুই কি সৌজন্য? আমাদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় নেই, আমাদের খুশি করার বাধ্যবাধকতা নেই, আমাদের কাছ থেকে কোনো উপকারের সম্ভাবনা নেই। আমরা কেউ বিজ্ঞানের লোক নেই, এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু তাঁদের আগ্রহটা একটুও মেকি ছিল না। শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই একজনের সঙ্গে আমরা বেরোলাম।

রবীন্দ্রনাথের নরকবাস কাব্যনাট্যে একটা ঘটনা আছে। রাজা সোমক মৃত্যুর পর যখন স্বর্গাভিমুখে যাচ্ছিলেন তখন প্রেতলোকের দরজার কাছে আত্মারা তাঁর পথরোধ করেছিল। তারা সমস্বরে করুন মিনতি করে তাঁকে ডাকছিল। তারা বলছিল রাজা সোমকের গায়ে এখনও মর্ত্যলোকের ধূলিকনা লেগে আছে। তিনি ক্ষনকাল দাঁড়িয়ে এই প্রানস্পর্শহীন নিরালোকবাসীদের তার দুর্লভ স্পর্শটুকু দিয়ে যান। কর্মোপলক্ষ্যে যে কটি শিক্ষিত শহুরে ভদ্রসন্তান রাম্মাম এ থাকেন তাঁদের অবস্থাও খানিকটা এইরকম। আমাদের মত সম্পূর্ন ভিন্ন রুচির, ভিন্ন বৃত্তির, গ্ল্যামারশূন্য, অধিকবয়সী, অসমবয়সী, অপরিচিত, গুটিকত স্ত্রীপুরুষের সান্নিধ্যও তাঁদের কাছে স্পৃহনীয়, কারন সামাজিকভাবে আমরা এক স্তরের লোক সকলেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমতলবাসী বাঙ্গালী, আমাদের গায়ে শহরের গন্ধ লেগে আছে।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। রাম্মাম ছিল একটি অখ্যাত পাহাড়ি গ্রাম। তার ধার দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট নদীটির নামও রাম্মাম। এই নদী, এবং অনুরূপ আর একটি নদী (নাম মনে নেই) এখানে এসে মিলেছিল এবং তাদের মিলিত ধারা খরস্রোতে নীচে নেমে গিয়েছিল। সঙ্গম স্থলের আশেপাশে যে লোকালয় ছিল তার অধিবাসীদের জীবিকা ছিল উপত্যকার ঈষৎ সিক্ত ভূমিতে খাঁজ কেটে চাষবাস, এবং বনের কাঠকুটো ফলপাকুড় সংগ্রহ। এ জীবন শ্রমকঠিন কিন্তু যাপনের অযোগ্য নয়। সারা ভারতে লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক গ্রাম এইরকমেরই। এটা হওয়া উচিত কি অনুচিত। আধুনিক সভ্যতার প্রসাদ সবার ঘরেই পৌঁছানোর দরকার আছে কি নেই সেই সমস্ত সমাজতত্বঘটিত প্রশ্নের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। খোলা চোখে যা দেখা যায় তা এই যে যতক্ষন মানুষের মধ্যে ভিন্নতর জীবনযাপনের চেতনা দেখা না দিচ্ছে, ততক্ষন পর্যন্ত সে নিজের অবস্থাকে মেনে নেয়, এবং প্রতিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়। এই পার্বত্য জনপদের আদি অধিবাসীরাও সেটাই করত। তারা গরিব ঠিকই, কিন্তু নিজের সমাজে, স্বজন প্রতিবেশিদের মধ্যে, অভ্যস্ত পরিবেশের মধ্যে পুরুষানুক্রমে থাকতে থাকতে তাদের একটা স্বকীয় জীবনছন্দ ছিল, এবং এখনও আছে। অপর পক্ষে যাঁরা বাইরে থেকে এসেছেন তাঁদের নিজ সমাজ স্বজন পরিবেশ ও বরাবরের অভ্যাস সব ছেড়ে আসতে হয়েছে। অথচ সংখ্যায় তাঁরা এত কম যে তাঁদের নিজেদের একটা সমাজ গড়ে উঠবার কোনো সম্ভাবনা নেই। নগরে একাকী মানুষেরও দিন কেটে যায়, কারন সেখানে নানা দিক থেকে নানা মানুষের ধারা এসে মিশেছে। মন ভরাবার মত নানা জিনিস আছে। কিন্তু এখানে সভ্যজগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে, দুটো কথা বলবার মত লোকও না পেয়ে দিনের পর দিন থাকা অসহনীয়। আমাদের গাইড বলছিলেন নতুন ছেলেগুলো আসে, কোয়ালিফায়েড ছেলে সব, দুদিন পরে নষ্ট হতে আরম্ভ করে, নেশা শুরু করে দেয়। এখানে কেউ সপরিবারে বাস করেননা। প্রধান কারণ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া। যাঁদের ছেলেমেয়েরা ছোটো তাঁরা এখানে তাঁদের এনে রাখতে ভয় পান কারণ এই যোগাযোগহীন স্থানে যদি তাদের অসুখ করে, যদি কোনো দূর্ঘটনা ঘটে তাহলে কি হবে। তাই বাড়ির লোকেরা কখনও সখনও বেড়াতে এলেও থাকতে পারে না। গাইড বলছিলেন - আমাদেরই বা ভরসা কি? গতবছর আমাদেরই একজনের হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হল; চোখের সামনে লোকটাকে ধড়ফড়িয়ে মরে যেতে দেখলাম, কিছু করার ছিল না।

এই অবস্থায় নিজেদের কাজ নিয়ে গর্ব করে তাঁরা সান্ত্বনা পান। দেখে যান আমরা কী করি। আপনারা ঘরে বসে সুইচ টিপে আলো পাখা পাবেন বলে দেখুন কী বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন। বিশাল নিঃসন্দেহে। ভারি ভারি লকগেট, টার্বাইন, কলকব্জায় চারিদিক পরিপূর্ণ, গুম গুম ধ্বনিতে কান পাতা যায় না, কিন্তু এত কান্ড করে কতটুকু বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এখানে? এ যে সমুদ্রে শিশিরবিন্দু। অথচ ওইটুকু হওয়াবার জন্য কী বিপুল সমারোহ, প্রকৃতির ওপর কী অপরিসীম নির্যাতন। যতটুকু লাভ তার চেয়ে ঢের বেশী সম্পদ গলে যাচ্ছে অপচয়ের খাতে। এ যে সামান্য ক্ষতি কবিতার কাশীর মহিষীর মত কাজ, ঘরে আগুন দিয়ে শীত নিবারনের বিলাস। আসবার সময় দেখে এসেছি পাহাড়ের পর পাহাড় জুড়ে গাছপালা ফাঁকা হয়ে গেছে। আরও হবে। দরকার না থাকলেও প্রজেক্টের ছুতোয় ফাঁকা হবে। ঝকঝকে রোদ্দুরে নীচের উপত্যকা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঐ দূরে সাদা সুতোর মত দুটো নদী মিশেছে। ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে মেঠো পাকদণ্ডী পথ। জনবিরল সেই পথের আশেপাশে, সারা বনভূমিতে কোথাও কোনো ফুল ফুটে নেই। শঙ্কিত গাছেরা এই ভরা বসন্তেও ফুল ফোটায় নি। মনে পড়ল আজ ভোরে কোনো পাখির ডাক শুনিনি। দেখিও নি কোনো পাখিকে উড়ে যেতে। কোথায় গেল এই পর্বতের বর্নিল বিহঙ্গেরা। ঘুরতে ঘুরতে অফিস ঘরের পেছন দিকে চলে এসেছি। গাঁদা ফুলে সাজানো একটুকরো বাগান। তারপর অনুচ্চ পাঁচিল। পাঁচিলের ওপারে অনেক নীচে ছোট বড় পাথর ছড়ানো নদীখাত। খাতই আছে, নদী আর নেই। তাকে আগেই বেঁধে ফেলে টানেলের মধ্যে চালান করে দেওয়া হয়েছে। আপাতত : অনেক পাথরের মাঝখানে একটি সরু নালা বয়ে যাচ্ছে। তীরের পাথরগুলি হাড়ের মত সাদা, জলের পাথরগুলি নীলাভ সবুজ। সেই জলের ধারে ছবির মত স্থির হয়ে বসে আছে দুটি ছেলে। একটি নিতান্তই ছোট, বছর আট দশ বয়স হবে অপর টি একটু বড়। ওরা কি করছে? মাছ ধরছে। কিভাবে ধরছে? ওদের হাতে ছোট জাল বাঁধা আছে। কেমন মাছ পড়ে? মাছ আর আছে কোথায়! একঘন্টা দুঘন্টা বসে থেকে দু একটি মাছ যদি পায় বাড়ি নিয়ে যাবে খাবার জন্য।

।। চার।।

কতবার যে উত্তরবঙ্গে গেলাম। শেষরাতে কোনো একটা এক্সপ্রেস ট্রেন আমাদের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে যায়। এসব পার হয়ে আমাদের গাড়ি যখন পাহাড়ে ওঠে, কিংবা তিস্তার ধার দিয়ে দিয়ে চলে তখন পরিস্ফুট বেলা। হয়ত তখন শরৎকাল, কিংবা বসন্ত। পাহাড়পথের বহুবার চেনা দৃশ্য, একপাশে বন অন্যপাশে খাদ শুরু হওয়া মাত্র ভিতরে ভিতরে একটা আনন্দের শিহরন বয়ে যায়। আঁকাবাঁকা পথে গাড়ি চলেছে, কিন্তু কোন বাঁকে কী ধন দেখাবে বুঝতে না বুঝতে পার হয়ে যাচ্ছে বাঁক। আজকাল পাহাড়ের ভেতর ভালো ভালো রাস্তা হয়েছে। রেলস্টেশন থেকেই নানারকম যানবাহন পাওয়া যায়। বাস সার্ভিসও খারাপ নয়। আধুনিক নগর সভ্যতার এইসব অবদান হাতের কাছে এসেছে বলেই না আমাদের মত গুটিকত আনাড়ি, ভীরুস্বভাব, দুর্বলদেহী মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে দেশভ্রমণ। তবু কিছু অসন্তোষ থেকে যায়। ভ্রমণান্তে, অথবা ভ্রমণ করতে করতেও।

কেবলি মনে হয় ভালো করে দেখা হল না। বার বার মনে পড়ে অতীতকালের সেইসব তীর্থযাত্রী অভিযাত্রীদের কথা যাঁরা পায়ে হেঁটে আসমুদ্র হিমাচল পারাপার করতেন। একালে যাঁরা ট্রেকিং এ যান ঐ পায়ে হাঁটা ব্যাপারটায় এঁদের সঙ্গে মিল আছে বটে, তবে গরমিলই বেশি। একালের ট্রেকিং দলগুলি সাধারনত: প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত (অন্তত : অভিজ্ঞ),

এবং আধুনিক ভ্রমণোপকরনে উত্তমরূপে সুরক্ষিত। যানবাহনের অভাবে যে এঁরা পায়ে হাঁটেন তা নয়। জনমানবহীন দুর্গম স্থানে এঁরা যান অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। যৌবনের যে শক্তি বাধা মানে না, দুর্জ্ঞেয়কে জানতে এবং দুর্জয় কে জয় করতে যা সদাই উন্মুখ এঁরা সেই শক্তির প্রতীক। অতীত কালের ভ্রাম্যমানেরা আদৌ তা নয়। তাঁরা যে সবাই যুবাবয়সী হতেন তাও একেবারেই নয়। আসলে সেকালের সেই ভ্রমণ তা সর্বসাধারনের জন্য ছিল না। তার জন্য অন্যরকম একটা মানসিকতা লাগত। অর্থবলের চেয়েও বেশি দরকার হত সময়ের এবং কষ্টসহিষ্ণুতার। সেকালের সেই ভ্রমণে অনেকখানি সময় নিয়ে থেমে থেমে ধীরে ধীরে যেতে হত বলে চারিপাশের মানুষজনের সঙ্গে পরিচয় হত। স্থানীয় মানুষও এঁদের দেখত সম্ভ্রমের চোখে, এবং সেজন্য হৃদয়দুয়ার উন্মুক্ত করতে তারা ভয় পেত না। তারা এখনকার মত মনে করত না যে শহুরে বাবু বিবিরা দুদিন ফুর্তি করতে এসেছে, ওরা বাইরের লোক। কত রকম মানুষের সঙ্গে যে তাঁদের যোগাযোগ হত তার শেষ নেই। মালবাহক কুলি দীর্ঘদিন ধরে পাশে পাশে চলছে, সে হয়ে যেত পরম বন্ধু। চটিওয়ালা, গাইড, পান্ডা ইত্যাদিদের নিয়ে তৈরি হত আর একটা বৃত্ত। দলবেঁধে যে যাত্রীরা একসঙ্গে যাচ্ছেন পরস্পরের সঙ্গে পথক্লেশ ভাগ করে নিতে নিতে সুখদুঃখেরও অংশীদার হয়ে যেতেন তাঁরা। বন্ধুলাভ, বন্ধুবিচ্ছেদ, কলহ অভিমান, স্নেহ সমবেদনা অহরহ তরঙ্গিত হত। পথের মধ্যে জুটে যেত সন্তান, পিতামাতা এমন কি ভাগ্যবানের কপালে প্রেমও। আর যাঁরা একা পরিব্রাজক হয়ে যেতেন তাঁরা খোঁজ করতেন সাধু সন্ন্যাসীর। এবং ভণ্ড তপস্বী থেকে মহাতপা মুনিঋষি পর্যন্ত কতরকম সাধুসন্তের যে হদিশ পেতেন তার ঠিকঠিকানা নেই। এইভাবে ছড়িদার দোকানদার, পান্ডা, কুলি, থেকে মৌনব্রতী, গুহাবাসী, একাহারী দুর্লভদর্শন সাধুসন্ত পর্যন্ত তাঁদের পরিচয়ের পরিধি বিস্তৃত হত। নতুন দেশ মানে যে শুধু গোটাকতক পাহাড় নদী বন মন্দির নয়, তার চেয়েও বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবজীবনের শতধারা সেটা তাঁরা জানতে পারতেন।

আমাদের সে উপায় নেই। ধরা যাক কোনো অলৌকিক যাদুকর মন্ত্রবলে আমাদের নিমিষে একশো বছর আগের বঙ্গদেশে নিয়ে গেল। শিলিগুড়ি কিংবা হরিদ্বার অবধি রেললাইন আছে। তারপর আর কিছু নেই। আমাদের কজনের সুযোগ হত দেশ বেড়ানোর। সমাজ ছিল রক্ষণশীল, আয় ছিল অত্যল্প। যৌবন শুরু হতে না হতে ছেলেরা বাঁধা পড়ত পরিবার প্রতিপালনের জাঁতাকলে, আর মেয়েরা ছিল অন্তঃপুরে অন্তরীন। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে আবার কী সেই জীবনটা চাও সভয়ে বলব না, না, কখনোই না। তাই একালের মানুষ একালের নিয়মেই বেড়াই, আর সেকালের ভ্রমণবৃত্তান্তের সাহায্যে অপূর্ণ আশাগুলিকে লালন করি। মনে মনে নিজেকে প্রবোধ সান্যালের স্থলাভিষিক্ত করে চলে যাই মহাপ্রস্থানের পথে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে প্রথমে গেরুয়া রঙে জামাকাপড় ছোপাই, তারপরে কেড্‌স্ জুতো কিনি, পাহাড়ে হাঁটবার লাঠি কিনি, টাকাপয়সা যা আছে রুমালে বেঁধে পকেটে পুরে ঝুলি ঘাড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। পথে পথে বন্ধু জোটে, কেউ উপকার করে, কেউ উপগ্রহ হয়ে শোষণ করে। পথিমধ্যে অসুখে পড়লে সঙ্গীরা ছলছল নেত্রে আরোগ্যকামনা করেও চটিতে একা ফেলে রেখে চলে যায়, কারণ তীর্থযাত্রীদের সেটাই নিয়ম। তারা চলে গেলে আমি ভাবি শেষবারের মত একবার পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান করে নিই। অবগাহন স্নান করি, আর জল থেকে উঠেই দেখি সব রোগব্যাধি নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে। এরকম অ্যাডভেঞ্চার যখন পছন্দ হয় না তখন ভাবি রানী চন্দের মত করে বেড়ালেই বা মন্দ কি। সমমনস্ক জনাকতক আত্মীয়বন্ধু মিলে তীর্থে যাচ্ছি। অর্থচিন্তা নেই। মিশনের সাধুরা আগে থাকতেই কোথায় কি করতে হবে সব টিপ্‌স্ দিয়ে রেখেছেন। সঙ্গে যাচ্ছে জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে একদল কুলি। তাদের নেতা জলপা আগে আগে গিয়ে চটিতে জায়গা ঠিক করে বিছানা পেতে রাখছে। আমরা গিয়ে পৌঁছনোমাত্র মুখের কাছে ধরছে গরম গরম চা। আবার এ সব পরিকল্পনা মিলিয়ে যায়। মনশ্চক্ষে দেখতে পাই এক উদাসীন পুরুষকে, যারা দেহের যৌবন শেষ হয়েছে। কিন্তু মন জেগে উঠেছে এক ভিন্নতর সঙ্কল্পে। গোমুখ পার হয়ে আরও দূর উৎসের দিকে সে যাবে। সেদিকে কোনও বাঁধা পথ নেই। যেটুকু ছিল সেখানেও ধস নেমে ভেঙে গেছে। বারান্দার মত ঝুলে আছে বিরাট একটা আলগা পাথরের চাঁই এবং তৎসহ একটা গাছ। পরিব্রাজক সেই গাছের ডালটি ধরে আলগা পাথরের ওপর পা রাখল, তারপর নামল খরস্রোতা ফেনিল নদীতীরের নুড়িপাথরের ওপর। সন্তর্পণে সে পার হয়ে যাচ্ছে ঐ বিপদসঙ্কুল এলাকা। দূর থেকে একটি কালো বিন্দুর মত তাকে দেখাচ্ছে। এইসব লোকেদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি। যাত্রাপথের সমস্ত রূপরসগন্ধস্পর্শ তাঁরা যেভাবে শোষণ করে নিতেন সেইরকম নিতে চেষ্টা করি। এদিকে বাস্তবে তখন হোটেলের দরজায় টাটা সুমো এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা তৃপ্তিকর ব্রেকফাস্ট খেয়ে উষ্ণ ও নরম পোষাকে নিজেদের মুড়ে তার ভেতরে ঢুকেছি। মসৃণ পথ ধরে আমাদের গাড়ি গড়িয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভিউপয়েন্টে থামছে। আমরা নেমে এসে ফটাফট ছবি তুলছি। কয়েক ঘন্টার মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। কোনো কষ্ট নেই। দৈনন্দিন অভ্যাসের বিশেষ ব্যতিক্রম হল না। না লাগল শরীরে একটু ধুলো, না লাগল মনে একটু হাওয়া। চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্যাবলী সিনেমার ছবির মত ছিটকে ছিটকে ওঠে। মানুষ থেকে যায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। কেনাবেচা ছাড়া কারও সঙ্গে কোনো বাক্যালাপ হয় না। অনবরত স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার ফলে মন কোনো কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির হতে পারে না। তাই মহৎ দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়েও সে হয়ে থাকে নির্বিকার। সময় নেই। সময় নেই। যত কম সময়ে যত বেশি দেখতে পাবে দেখে নাও। যত বেশি দেখবে তত তোমার কষ্টার্জিত পয়সার সদ্ব্যবহার হবে।

এই ভ্রমণে আমরা যে মানুষজনকে দেখি তাদেরও নিসর্গের অংশরূপেই দেখি। ঐ তো রিসপের কাঁচা পথ দিয়ে চলেছে পাহাড়ি স্ত্রী পুরুষ। আজকের দিনের পূর্ব হিমালয়ে আত্মস্বাতন্ত্র্যকামী আন্দোলন নিয়ে, নিজেদের জাতিসত্তার গৌরব নিয়ে যারা আদৌ ভাবিত নয়। মাথায় ঘাস জঙ্গলের বা কাঠকুটোর বিরাট বোঝা নিয়ে একটু ঝুঁকে তারা রাস্তা দিয়ে চলেছে। এত বড় বড় বোঝা যে তাদের ছোটখাটো শরীর তাতেই ঢাকা পড়ে গেছে। আমরা সমতলভূমির মানুষ, আমরা কল্পনাই করতে পারব না পাহাড়ে দৈনন্দিন জীবনযাপনের সাধারন কাজগুলিই কত শ্রমসাধ্য। এখানে এই লাভা, রিশপ, পেডং, রিকিসম প্রভৃতি স্থানে পাহাড়চুড়া ঘিরে গড়ে উঠেছে হোটেল রিসর্ট দোকানবাজার প্রভৃতি। আর নিচের দিকে রয়েছে গ্রাম। সেখানে সংকীর্ণ জমিতে প্রায় আদিম জুম চাষের প্রণালীতে খাঁজ কেটে কেটে মাটি তৈরি করে লাগানো হয়েছে বাঁধাকপি আর কোয়াশ। অন্য খাদ্য এখানে দুর্লভ। শীতের দেশ বলে এদের গায়ে কিছু জামাকাপড় আছে বটে, তবে তা চামড়ার মতই শরীরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে। জুতোর অবস্থা অতি শোচনীয়। শীতের দেশের তা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। জল এখানে দুর্লভ জিনিস। তাই যেখানে যেখানে পাহাড়ি ঝোরার দর্শন মেলে দেখা যায় তারই কাছে মেয়েদের জটলা। তাদের সংসারের মাজা ধোয়ার কাজে নিযুক্ত। তাদের নানা রঙের কাপড় দেখে দূর থেকে মনে হয় যেন একঝাঁক প্রজাপতি; কাছে গেলে বোঝা যায় তাদের শ্রমকঠিন মুখে যৌবনেই বলিরেখা পড়েছে। সঙ্গের শিশুগুলির নাক দিয়ে সিকনি গড়াচ্ছে। ফুটিফাটা গাল মলিন ধূলিময়। প্রত্যন্ত এলাকার পাহাড়ি গ্রামে ওষুধপত্র ও চিকিৎসা এই শব্দদুটি অজ্ঞাত। তাই বেড়াতে গিয়ে আমরা যে উপত্যকায় আলোছায়ার খেলা দেখে মুগ্ধ হই, যেখান থেকে উঠে আসে মেঘ, জন্ম নেয় চলমান রামধনু সেখানে দৈনন্দিন জীবন শ্রমে কঠোর এবং নিরাপত্তার অভাবে অসহায়। রিশপে থাকাকালীন একটা ঘটনা দেখেছিলাম। গাছ কাটতে গিয়ে একটি ছেলে পা ফসকে উঁচু থেকে পড়ে গিয়েছিল। শরীরের নানা জায়গার হাড় ভেঙে গেছে। তাকে ডুলি করে কয়েকজন মিলে ওপরে হোটেলে বয়ে নিয়ে এসেছে। এই আশায় এনেছে যে যদি এখান থেকে কালিম্পংগামী কোনো জিপ যায়, যদি সেই জিপের যাত্রীরা দয়া করে তাদের নিয়ে যায় কালিম্পং এর হাসপাতালে। সমস্ত ব্যাপারটাই নির্ভর করে আছে অনেকগুলি যদি, হয়ত ইত্যাদির ওপর। এবং এমন সময়ে যখন প্রাণ বাঁচাবার জন্য প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান।

যাই হোক, এমনি করেই চলছে পাহাড়ের জীবনযাত্রা এবং আমাদের পর্যটন। বেড়াবার জায়গা বাড়ছে, বেড়াতে যাবার লোকও বাড়ছে। এরই মধ্যে অলক্ষিতে বদলে যাচ্ছে আমাদের ভ্রমণের ভুবন। সেবার গাড়োয়াল যাবার সময় এক মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হল। তিনি আদিতে কলকাতার লোক, কিন্তু এখন চাকরিসূত্রে অনেকদিন ইংলন্ডে আছেন। স্বামী স্ত্রী দুজনেই ওখানে কাজ করেন। নিজের কর্মস্থলের কি একটা গল্প তিনি করছিলেন একজনের সঙ্গে। তার মধ্যে দু একটা স্থানের নাম শুনেই আমি উৎকর্ণ হলাম। এ যে টমাস হার্ডির ওয়েসেক্‌স্ টেল্‌স্ এর দেশ। আগ্রহভরে আমি তাঁর গা ঘেঁষে বসলাম এবং অচিরে আমাদের ভাব হয়ে গেল। অনেক সুখ দুঃখের কথাও হল। তিনি বললেন - আমি বছরে, দু বছরে যখনই দেশে আসি একবার বেড়াতে বেরোবোই। আমি বললাম - কেন ওখানে কি ছুটিছাটা পান না? উত্তরে তিনি যা বললেন তা এইরকম - ছুটি যা পাবার ঠিকই পাই। আর ওদেশে বেড়াবারও প্রচুর সুবিধা। উইক এন্ড হোল তো লোকে দিগ্বিদিকে ছুটছে। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, সব সমুদ্রতীর, সব হ্রদ, সব বড় বড় শহর একের সঙ্গে অন্যের কোনো তফাত নেই। এত সাজানো, এত পরিষ্কার, সব জায়গার ব্যবস্থা এত একরকম ভালো যে নতুন জায়গায় গেলেও নতুন বলে মনে হয় না। আর আল্‌প্‌স্? আল্‌প্‌সের কথা আর বলবেন না। ও তো আর পাহাড় নেই। টুরিস্টদের বাগান হয়ে গেছে। এক চুড়ায় রোপওয়ের জালি পাতা। তাই দিয়ে দিয়ে চলে যান না যেখানে খুশি। তাই আমি এদেশে হিমালয়ে যাবার দল খুঁজি। ওখানে এখনো আসল পাহাড় আছে। আসল নদী বন গাছপালা আছে।

আছে কি? গত গছর গঙ্গোত্রীর পথে শুকনো ঘাসজঙ্গল দেখিয়ে ড্রাইভার বলল দুবছর এখানে বর্ষা নেই। দেখুন গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে। তারপর নিজের সহযাত্রী কিশোর ভাইপোটিকে দেখিয়ে বলল এ যখন বড় হবে তখন হয়ত গঙ্গাজীই থাকবেন না, পাতালে চলে যাবেন, আমি চমকে উঠলাম। বড় বড় পরিবেশবিদরা অনেক হিসাবনিকাশ করে

যা বলেছেন ঠিকই সেই কথা এই অশিক্ষিত দেহাতি লোক কী করে বলল। পৃথিবী ক্রমশ: উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সেটা সারা পৃথিবীর সমস্যা। কিন্তু ভারতবর্ষের জলস্থল তার চেয়েও ঢের বেশি দ্রুতগতিতে বদলে যাচ্ছে। বেশী না। মাত্রই গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অপরিণামদর্শী, কুপরিকল্পিত, স্বেচ্ছাচারী নদীশাসনের ফলে ভারতবর্ষের সব নদী শুকিয়ে গেছে। হরিদ্বারের নীলধারা থেকে কটকের মহানদী পর্যন্ত বিপুলবাহিনী বেগবতী নদীগুলি আজ বিস্তীর্ন বালুকাশয্যায় জীর্ণ মৃতপ্রায় হয়ে ধুঁকছে। অপরপক্ষে স্বভাবসুন্দর গিরি নদী বনের অঙ্গে উঠছে হালফ্যাশনের রুচিহীন সাজসজ্জা। নৈনিতাল শহর তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হ্রদের নীলাম্বরীর মত কালো জলে ভাসছে হলুদ রঙের কুৎসিত ময়ূরপঙ্খী, আর, এক পাহাড় থেকে অপর পাহাড়ের চূড়োয় কাঁচের বাক্সে মানুষ পুরে রোপওয়ে দিয়ে চলছে আকাশবিহার। পূর্ব হিমালয়ও বাদ নেই। শুনেছি এদিকে কোথায় যেন হেলিকপ্টার সার্ভিস হয়েছে। তারা অত্যল্প সময়ে সবকটি পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাত্রীদের ঘুরিয়ে আনে। ওভাবে পর্বত পরিক্রমার সৌভাগ্য এখনও আমার হয় নি। তবে এবার কালিম্পং গিয়ে আমার সেই ইংলন্ডবাসিনী ভ্রমণবন্ধুর কথার সত্যতা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।

কালিম্পং থেকে অল্প দূরে নতুন একটি টুরিস্ট স্পট তৈরি হয়েছে। তার নাম দেলো। একটিমাত্র গোলাকৃতি ছোট পাহাড়। পাহাড়ের গড়নটি অভিনব। যেন প্রকৃতির খেয়ালে মাটি পাথরের কোনো বিশাল ঢেউ ক্রমে উঁচু হতে হতে শীর্ষবিন্দুতে গিয়ে হঠাৎ ভেঙে পড়েছে। ঐ শীর্ষবিন্দুর ওপর একটি হোটেল। অত্যন্ত সুন্দর তার স্থাপত্য ও ব্যবস্থাপনা। প্রতি ঘর ও সংলগ্ন বারান্দা থেকে দেখা যায় দিগন্তবিস্তৃত অবারিত উপত্যকা এবং উপত্যকার ওপারে আকাশপটে অর্ধবৃত্তাকারে দন্ডায়মান তুষারশৃঙ্গগুলি সব। শুনলাম হোটেলটি যারপরনাই বিলাসবহুল এবং দামি। এখানকার অতিথিরা বেশিরভাগই বিদেশি। চোখেও দেখলাম সাদা সাহেব মেমদের বাইনাকুলার নিয়ে পাহাড় পর্যবেক্ষণ করতে। তবে হোটেলে না থাকলেও সংলগ্ন বাগানে সাধারনের প্রবেশাধিকার আছে (টিকিট কেটে)। বাগানটি সুবিশাল, একটা গোটা পাহাড়ের ওপরের অংশ নিয়ে তৈরি। সবখানি ঘুরে দেখতে গেলে একবেলা লেগে যাবে। এই বাগানে ঢুকে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মূল গেট থেকে ভেতরে ঢুকেছে বাঁধানো রাস্তা। সেই রাস্তা থেকে অসংখ্য মসৃণ সুন্দর লাল সুরকির শাখাপথ বেরিয়ে বিভিন্ন উচ্চতায় গিয়ে শেষ হয়েছে। সেই শীর্ষবিন্দুগুলিতে একটি করে কাঠের বা সিমেন্টের বসবার জায়গা। মাথার ওপর অনুরূপ ছাতা বা ছাউনি। প্রতি আসন থেকে দিগন্তের দৃশ্যটি পুরো দেখা যাবে এমন পরিকল্পনা করেই তারা তৈরি। এই উদ্যানে ওই অঞ্চলের নিজস্ব কোনো গাছপালা নেই। আছে শুধু মখমল কোমল সবুজ ঘাসের জমি। তার ধারে নানারকম মরসুমি ফুলের কেয়ারি। মাঝারি আকারের গাছও বেশ কিছু আছে বটে, তবে তাদের ডালপালা এমন সুকৌশলে ছাঁটা যে মনে হয় তারা গাছ নয়। এক একটি বড় বড় সবুজ ছাতা। বাগানের মধ্যস্থলে ভোজনালয়। চিপ্‌স্‌, স্ন্যাক্স, কোল্ড ড্রিংক, আইসক্রীম এই সব বিক্রি হচ্ছে। কাঠের জাফরি কাটা ঝরখায়, প্রাঙ্গনের রঙিন ছাতায় দূর থেকে সেটিকেও মনে হয় আরেক রকম ফুলবাগান। কোথাও একফোঁটা ধুলোময়লা নেই। ভাঙাচোরা নেই। এমন কি চেঁচামেচি হুড়োহুড়ি অবধি নেই। দু একটা শিশু শুধু স্বভাবদোষে দৌড়চ্ছে। এ ছাড়া সবই সুশৃঙ্খল। ওখানকার ভিউপয়েন্টে বসে আরাম করে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে দেখতে মনে হল যেন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের অনুষ্ঠান দেখছি। অথচ এর দুদিন আগেই রিসপ ঘুরে এসেছি। সেখানকার পাহাড়চূড়া থেকেও মোটামুটি একই দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে হোটেলের উঠোনটুকু ছাড়া আর সবই ছিল বন জঙ্গল। বনবিভাগের বনও নয়। একেবারে আদিম জঙ্গল ও ঝোপঝাড়, ভাঙাচোরা কাঁচা পথে জিপগাড়িতে করে দুলতে দুলতে টাল খেতে খেতে আমরা ওখানে পৌঁছেছিলাম। যাদের শরীরে শক্তি আছে তারা এসেছিল বনের মধ্য দিয়ে গাইড সঙ্গে করে হেঁটে হেঁটে। সেখানে সামনে পিছনে উপরে নীচে পৃথিবীটা ছিল একসুরে বাঁধা। রম্যবীণা নির্ভুল বেজে উঠেছিল। যতদূর জানি সেই রিশপ এখন আর নেই।

আজ বুঝতে পারি আমরা যে ভূমণ্ডলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি আমাদের উত্তরাধিকারীরা সেখানে বেড়াবে না। আমরা যেমন আমাদের আগের জলস্থল গিরিগুহাকে বাস্তবে পাই নি, কেবল কল্পনায় দেখেছি, ভবিষ্যৎকালের লোকেরাও তেমনি আমাদের চেনা জগৎটাকে কল্পনায় পাবে। আর যদি নাও পায় তাতেই বা কি ক্ষতি? আগে কোথায় কী ছিল আমরাই বা তার কতটুকু মনে রেখেছি? ভুলে যাওয়ায় আমাদের কীই বা ক্ষতি হয়েছে। এই যে বহু শতাব্দীপ্রাচীন নগরী বারানসী, নদীসঙ্গমে এর যে চেহারা আজ আমরা। অতৃপ্তনয়নে দেখি তা কি আগে ছিল? এই যে নদী থেকে প্রাসাদোপম শতাধিক ঘাট সোজা উঠে গেছে, জলে পড়েছে তাদের ছায়া, এই রাজকীয় বৈভব ছাড়া বারানসীকে আমরা ভাবতেই পারি না। অথচ ঘাটগুলি তো এই সেদিন হল রানী অহল্যাবাইয়ের আমলে। এ ও তো নৈসর্গিক নয়, সাজিয়ে তোলা শোভা। আর এতেই আমরা অভ্যস্ত। তাই আগামী দিনের ভ্রমণ মানচিত্রে যদি আদিম গিরি নদী বন আর না থাকে, নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় না হয়, মন হয়ে তাকে নিরুত্তাপ অসাড়, গতির উত্তেজনা ছাড়া অন্য কোন লাভ যদি পথিকের নাও হয়, তাহলেও তা খুব একটা যাবে আসবে না, কারণ দেশ ভ্রমনের কাছে তার চাহিদাটাই যাবে বদলে। যার যেমন অন্তঃপ্রকৃতি সে তেমন করেই খুঁজে নেবে আপনার চিত্তপ্রসাদ।